তিন যুবতি এক মন

তিন যুবতি এক মন ২

তিন যুবতি এক মন ৩

তিন যুবতি এক মন ৪

তিন যুবতি এক মন ৫

তিন যুবতি এক মন ৬

তিন যুবতি এক মন ৭

তিন যুবতি এক মন ৮

তিন যুবতি এক মন ৯

তিন যুবতি এক মন ১০

তিন যুবতি এক মন ১১

তিন যুবতি এক মন

শহীদ আশরাফ

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭
অথবা
www. boibazar.com
হট লাইন ০৯৬১১২৬২০২০

তিন যুবতি এক মন	শহীদ আশরাফ
প্রকাশক	নালন্দা
	৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট)
	তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	তুহিন সাবের
প্রচ্ছদ	নিয়াজ চৌধুরী তুলি
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৩০০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ

©	Tuhin Shaber
Tin Juboti Ek Moon	Shahid Ashraf
Cover Design	Niaz Chowdhury Toli
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel
	Nalonda
	38/4 Banglabazar (Mannan Market)
	2nd Floor, Dhaka 1100
Price	300.00 Tk only
ISBN	978-984-98389-7-5
E-mail	nalonda71 @gmail.com

শহীদ আশরাফ

সত্যি কথা বলতে কী, বাংলার পাঠক সমাজে সৃষ্টি করেছে এক বিস্ময়কর আলোড়ন— যেখানে-সেখানে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে দেখতে পাই শুধু— সবাই পড়ছে গভীর প্রেমের এক নিবিড় কাহিনি—

হাসিনা জানত, আমার আচরণই আমার যথার্থ পরিচয়। জীবনের কঠিন সংকটে নির্মম সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষবারেও সেই পরিচয় দিল হাসিনা। আরও দুবার দিয়েছিল।

খালেদ জানত না। খালেদ ভাবত, আমার সঙ্গে আমার যা ধারণা সে-ই সত্যিকার আমি, আমার আচরণ আমি নয়।

মানুষ নিজের আচরণের মধ্যে তার সত্য পরিচয় গোপন করে রাখে।

খালেদ মানুষ এবং নিজের সম্পর্কে এই কাল্পনিকতাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। ফলে যেদিন বজ্রপাত হলো কাচের গেলাস ও মাটির ভাঁড় ছুড়ে ফেলে দিলে যেমন হয়, খালেদ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছিল। তার চেতনা ছিল না। তার চেতনায় ফিরে আসতে কয়েক মুহূর্ত লেগেছিল।

কিন্তু নিজেকে আর জোড়া লাগাতে পারেনি। যে তার চূর্ণ সত্তা কুড়িয়ে মুঠোয় করে, তার ভারে ন্যুব্জ এবং তার শোকে মুহ্যমান হয়ে, হেঁট হয়ে হেঁটে এসেছিল।

আসলে খালেদ তার জীবনের যাত্রা শুরু করেছিল এই মর্মান্তিক পরিণামের দিকেই। মনে হবে যেন পরিণাম কী জেনেই। বস্তুত, মানুষ আমরা সকলেই, ভবিষ্যতে যা ঘটবে অতীত থেকেই তার সূচনা করি। আমরা সেই সব কাজই করি, করতে থাকি, যা অনিবার্য ভবিতব্যের দিকেই আমাদের নিয়ে থাকে, নিয়ে যেতে পারে। আর বলতে কী ভবিতব্যও তো তাই সে তো আমরা আজ যা করি, সেই কাজেরই আগামীকালের— অবশ্যম্ভাবী পারিণাম।

খালেদের সেই অনিবার্য পরিণামের শুরু হয়েছিল এইভাবে : লায়লা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। খালেদ রাজি হয়নি। খালেদ পালিয়েছে। না, সহজে পালাতে পারেনি। পালিয়ে যাবে কোথায়?

মেসে বা হোটেলে গিয়ে উঠবে, সে সাহস তার ছিল না। সে বেকার ছিল। শুধু টিউশানি করত। ভাইদের স্নেহ ও সচ্ছলতার ছায়ায় লালিত খালেদ কেবল পড়েছে আর পাস করেছে, জানত না চাকরি কোথায় পাওয়া যায়। সে চেষ্টাও সে করত না।

সারাদিন রেস্টুরেন্ট, পার্কে ও বেকার বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিত। খেতে আর শুতে আসত বাড়িতে। তবু তার মধ্যে চেয়ে চেয়ে দেখত লায়লাকে। লায়লার সরু কোমর, প্রশস্ত নিতম্ব খালেদকে আকর্ষণ করত। তার গাল, ঠোঁট, ভুরু, খালেদের লোভকে উসকানি দিত। খালেদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল লায়লার ঘাড়— দিঘল-গ্রীবার নিচে মাখনের মতো মাংস।

আমার ইচ্ছে করে ঐ মাংস দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরি। লায়লাকে দেখতে দেখতে এই ইচ্ছেতে অভিভূত হয়ে যেত খালেদ।

—কী দেখ?

গ্রীবায় বঙ্কিম ভঙ্গি এনে প্রশ্ন করত লায়লা। ওর জবাব শুনে আবার জিজ্ঞেস করত?

—কেন?

খালেদ জবাব দিলে চোখ কুঁচকে হেসে বলত— দুষ্টু!

খালেদের ভালো লেগেছে লায়লাকে, লায়লা যেন মাখনের মতো গলে গেল। গরমের চাঁদনি রাতে ইজিচেয়ারে বারান্দায় শুয়ে ছিল খালেদ। শিশুর নিঃশ্বাসের মতো হওয়ায় শীতল হতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মনে হলো কে যেন তাকে চেপে ধরেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। দারুণ ভয়ে ভীষণ চমকে উঠল খালেদ। চিৎকার করেই বুঝি উঠত খালেদ। লায়লা হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। কানের কাছে মুখ এনে নিঃশ্বাসের স্বরে বলল।

—বীরপুরুষ ভয়ে একেবারে বিড়ালের মতো ফুলে বেঁকে উঠেছে। এই সাহস নিয়ে তুমি বাইরে শোও?

খালেদ লায়লাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে।

—তুমি আসতে পার, আসবে, এই বিশ্বাস নিয়ে এখানে শুয়েছিলাম, কানে কানে বলল খালেদ, আমি বেশিক্ষণ একা থাকব না সেইটেই আমার সাহস ছিল, কিন্তু ঘুমের মধ্যে হঠাৎ আচমকা জড়িয়ে ধরলে ভয় পায় না মানুষ?

—এখন?

খালেদকে জড়িয়ে ধরে তার গালে গাল রাখল লায়লা।

—এখন আর ভয় নয়, ভালো লাগছে।

লায়লার যৌবন জড়িয়ে ফিনফিনে একখানা শাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

পাতা সরিয়ে যেমন ফল ধরে লোকে তার আঁচল সরিয়ে অনাবৃত বুক মুঠোয় ভরে নিল খালেদ। গালে ও লায় চুমু খেতে লাগল তারপর ঘাড়ের

সেই নিটোল মাংসের কাছে এসে প্রবল উত্তেজনায় জন্তুর মতো কামড়ে ধরল তাকে।

সাপের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দ করে উঠল লায়লা।

—উঃ লাগে না বুঝি।

—লাগে?

দাঁতের চাপ আলগা করে তবু কামড়ে ধরে থাকে খালেদ। তার এক হাত তখন নামছে, কোমরের নরম মাংসের ভাঁজে নেমে এসেছে! লায়লা কেঁপে উঠে ওর হাত চেপে ধরল।

এই গহন চাঁদনি রাতে লায়লা স্বেচ্ছায় ওর কাছে এসেছে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। চুমু খেতে দিয়েছে। বুকের আপেল মুঠোয় ভরে তুলতে দিয়েছে। খালেদ ভেবেছিল ওর বুঝি এখন কিছুতেই আপত্তি নেই! এখন মনে হলো আপত্তি আছে কিংবা কী অনভ্যস্ত কুমারী শরীর পুরুষের কর্কশ হাতের স্পর্শে কেঁপে উঠেছে।

চেপে ধরেছে হাত। খালেদ থামল। থেমে ভাবল। না। আপত্তি নেই।

ও বলল তার আগে বিয়ে করতে হবে। আশ্বাস পেয়ে খালেদ ভরসা দিল বিয়ে করব।

—তুমি আমাকে ভালোবাস? খালেদের শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে জিজ্ঞেস করল লায়লা।

—খুব।

খালেদের হাত পুনরায় এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করল। লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে আরও শক্ত মুঠোয় লায়লা খালেদের হাত চেপে ধরল।

—না। ছিঃ, না। এখানে না, এখন না।

—কখন? কোথায়? খালেদ হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে বলল।

—বিয়ের রাতে। ফুলশয্যায়। কানের কাছে ঠোঁট এনে বলল লায়লা। ওর গলায় স্বর ফুটছিল না। ঠোঁট কাঁপছিল।

কিন্তু সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য এ নিশ্চিত সুযোগ মুলতুবি রাখার ধৈর্য ছিল না খালেদের। সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লায়লাকে কোলে তুলে মাটিতে শুইয়ে দিল।

তার গালে গাল ও বুকে বুক চেপে ধরল খালেদ। খালেদের ভয় ছিল লায়লা হয়তো চেঁচিয়ে উঠবে এখন। না সে চেঁচাল না কিন্তু খেঁকিয়ে উঠল কুকুরটা। ছাইগাদার পাশে নেড়ি কুত্তাটা ঘুমাচ্ছিল। ওটা ছুটে এলো। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল একটু দূরে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই ওদের মুখ দেখে, চিনে চুপ করে চলে গেল। আবার সেই ছাইগাদায় উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ততক্ষণে খালেদের মধুযামিনীর রুপালি স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেছে। ভাই জেগে উঠেছে, লায়লার বাবাও।

—কে, কে। দুঘর থেকেই একসঙ্গে সন্ত্রস্ত গলায় আওয়াজ উঠল।

খালেদ লায়লাকে ছেড়ে দিল। সে উঠে নিমেষে ছায়ার সঙ্গে মিশে গেল।

—তুই কোথায় গিয়েছিলি? একটু পরেই লায়লার বাবার গলা ভেসে এলো এপাশে।

—থামো তুমি। চেঁচিও না। লায়লার মার গলার আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে।

লায়লার মায়ের প্রশ্রয় আছে। হঠাৎ খালেদের মনে পড়ল এই করে সে তার আরও দুটি মেয়েকে পার করেছে। ভালোবাসা নয়, রিরংসাও না। ছেলে ধরা ফাঁদ। খালেদ কেঁপে উঠল। খোলা জানালার কাছে নগ্ন দীপশিখা জ্বললেই পোকারা এসে পড়বেই। পোকাদের ডানা পুড়বেই। সেই ডানা পোড়া আধ-মরা পোকাদের থেকে একটা সুন্দর পোকা বেছে নিয়ে লায়লার কপালে টিপ পরিয়ে দেবে তার মা। কী মর্মান্তিক ফাঁদ!

নিজেকে একটা অসহায় পোকা ভেবে বুক দুরুদুরু করতে লাগল খালেদের। এই প্রথম খালেদ ভয় পেল। খালেদের ভাই দরজা খুলে বাইরে এলেন।

—তুই এখনও বাইরে শুয়ে আছিস। তিনি পেচ্ছাব করতে চলে গেলেন।

খালেদ তখন গভীর ঘুমের ভানের মধ্যে ডুবে আছে। ভাই পেচ্ছাব করে ফিরে এসে ঠেলা দিলেন। খালেদ গভীর ঘুমের মানুষের মতো করে আচমকা জেগে উঠে ফ্যালফ্যাল করে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

—যা ঘরে গিয়ে শো। ভাই আর কিছু না বলে তার ঘরে গিয়ে খিল দিলেন।

ভাই কী কিছু বুঝতে পেরেছে। ওদের কথা কি ভাই শুনতে পেরেছে। খালেদ চিন্তা করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেল।

খালেদদের বাথরুম ও পায়খানা লায়লাদের দিকে। যেতে-আসতে সুযোগ পেলেই লায়লা এসে চড়াও হতে লাগল।

—কিগো, বাবাকে বলছ না কেন?

একেবারে বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়ায়। নিঃশ্বাস লাগে এসে গলায় ও গালে। চোখের কোণে দৃষ্টি এনে তাকায়। দৃষ্টিতে কী ধার!

খালেদের লোভ জাগে। এদিক-ওদিক তাকায় খালেদ। খালেদের বুক শুকিয়ে ওঠে।

বলব, বলব। খালেদ তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসে। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাব। খেতে আসতে হবে, শুতে আসতে হবে এবং যখনই আসব প্রতীক্ষায় অক্লান্ত লায়লা আমার কাছে আসবে। খালেদ চিন্তা করে। খালেদ ব্যকুল হয়ে ওঠে।

—কিগো সেদিন যে বড় তর সইছিল না। এখন তো দিব্বি আছ। আসলে তোমার উদ্দেশ্য ভালো ছিল না। তুমি আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিলে। খালেদের বুকে ধক-ধক-ধক-ধক স্টিম রোলারের শব্দ হতে লাগল।

—ওহো, মাথায় তেল দিইনি তো, মাথায় তেল দিতেই ভুলে গেছি, বলে কেটে পড়ল। কিন্তু কয়দিন এমনি করে কাটানো যাবে। লায়লার হাতের থেকে বাঁচার জন্য শেষে কি গলা কেটে মরবে। না, এখানে সে আর থাকবে না। কিন্তু কোথায় যাবে?

ভাইকে বলল খালেদ। কিন্তু তিনি বাড়ি ছাড়তে চান না।

—কিন্তু কেমন করে এ বাড়িতে থাকা যায় বলো? এক ফোঁটা পানি থাকে না চৌবাচ্চায়।

—তুই যদি বেলা দুটো গোসল করতে চাস, পানি কোথাও পাবি নে।

কিন্তু এই মশা-মাছি আর পচা ড্রেনের গন্ধ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

—তেমন বাসা তুই কোথায় পাবি। আজকাল চাকরি পাওয়ার থেকে একটা ভালো বাসা পাওয়া শক্ত। ভাই তার বেকারত্বের গায়ে খোঁচা দিল। অগত্যা খালেদ অন্য পথ ধরল। সে একদিন বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে বসল।

এক পাইপে আসে বাড়িওয়ালার পানি আর ভাড়াটেদের পানি। বাড়িওয়ালার কল খুললে ভাড়াটেদের চৌবাচ্চায় পানি পড়ে সুতোর নালে। বাড়িওয়ালা ইচ্ছা করে এই কারসাজি করেছে। তার চৌবাচ্চার লেভেল নিচু করেছে। তাছাড়া আপনারা হাত ধুতে কল খুলবেন, পা ধুতে কল খুলবেন, কাঁথা কাচবেন, কাপড় কাচবেন কল খুলে অথচ আমরা খেতে, নাইতে পানি পাব না। এটা চলবে না! কিছুতেই না। পাইপ আলাদা করে দিন। বাড়িওয়ালার পাইপ আর ভারাটেদের পাইপ পৃথক পৃথক থাকবে।

—নিজের পয়সায় করে নিন, বলল বাড়িওয়ালা।

—কেন, আপনার বাড়িতে আমি পয়সা খরচ করতে যাব কেন?

—তবে যে পানি পাচ্ছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।

—না, হাত ধুতে, পা ধুতে কল খুলতে পারবেন না আপনি। বাড়ির লোকদের বলে দেবেন, কাপড়-চোপড় চৌবাচ্চার পানিতে কাচতে।

—না তা হবে না, যেমন চলছিল তেমনই চলবে, না পোষায় উঠে যান।

—উঠে যাব? খালেদ এবার ক্ষেপল। তেড়ে গেল বাড়িওয়ালার দিকে। একটা হইচই কাণ্ড তখন। খালেদ একটা নাটকীয় মুহূর্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল।

ভাই অফিস থেকে ফিরলে বাড়িওয়ালা নালিশ করল। নালিশ ঠিক নয় নোটিশ দিল। আপনার ভাই যদি আর একদিনও এ বাড়িতে থাকে আমি তার বিরুদ্ধে ট্রেসপাশের নালিশ করব, মহিলাদের শ্লীলতা হানির অভিযোগ প্রমাণ করব। জেল খাটাব। খালেদ বাড়িওয়ালাকে এতখানি রাগাতে পেরেছিল ভেবে সুখী হলো।

খালেদ বলল, দরকার নেই মামলা-মোকদ্দমায়, আমি চললাম।

চলে এলো খালেদ। বেশি দূরে যেতে পারল না। দুটো গলির পরে তার বোনের বাসা। সেখানে এসে উঠল। বাঁচা গেল লায়লার হাত থেকে রক্ষা পেল সে।

কিন্তু তিন দিনের দিন ভোর বেলাতেই দেখল, না, খাঁড়া তেমনি মাথার উপর ঝুলছে। খালেদ জানত না বোনের বাড়ির গলিটা লায়লাদের স্কুলে যাওয়ার ওপথ। সেদিন সকাল বেলা উঠে রাস্তার কলের সামনে একটা নিমের দাঁতন চিবাচ্ছিল খালেদ। দূরে লায়লাকে আসতে দেখে মুখটা তার হলদে হয়ে গেল, বুকটা কেঁচোর মতো মুচড়ে উঠল। যার সম্মুখ থেকে পালাতে পারলে বাঁচা যায় তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা যে কী শাস্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালেদ তাই ভুগছিল। তবু লায়লা যখন নিকটে এলো খালেদ তখন এক গাল হেসে বলল— এতক্ষণে এলে? সেই কখন থেকে তোমার পথ চেয়ে 'দাঁড়িয়ে' আছি।

—ইস। অবিশ্বাসে লায়লা ঠোঁট বাঁকা করল, তার চোখের দৃষ্টি ক্রূর হলো।

—হ্যাঁ, করছ কী! বিশ্বাস হলো না বুঝি। আচ্ছা বেলা আটটার আগে আমার কখন ঘুম ভাঙে দেখেছ? কাল যেই ভাগনিটার কাছে শুনলাম এটাই তোমার স্কুলে যাওয়া-আসার পথ...।

—সারা রাতে আর ঘুম এলো না, ভোর না হতেই রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছ। আহা-হা-হা কী টান! লায়লা নির্মম কণ্ঠে ব্যঙ্গ করে উঠল।

—টান নয়? খালেদ বিষণ্ন হওয়ার ভান করল।

—না। ফুঁসে উঠল লায়লা। আমার জন্য এতটুকু টান থাকলে খামোখা বাড়িওয়লার সঙ্গে ঝগড়া করে ও বাড়ি তুমি ছাড়তে না।

—খামোখা! খালেদ চোখ বিস্ফারিত করল। এই প্রচণ্ড গরমে এক ফোঁটা পানি পাও না যে সাবান-টাবান মেখে গোসল করবে। ভালো করে

একটু গোসল করতে পারো না বলেই তো পিঠে ও পেটে চাকা চাকা ঘামাচি উঠেছে, হাতে লাগল সেদিন। এমন পালিশ করা মসৃণ চামড়া কুমিরের মতো খসখসে হয়ে গেছে। বাড়িওয়ালাকে যে মারিনি এই ওর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

—বটে, কী বীরপুরুষ, মারতে গিয়ে নিজে পালিয়ে এসেছেন।

—পালিয়েছি কী সাধে, গোপনীয় কথাটা প্রকাশ করতে গলাটা খাট করল খালেদ। তাই আমাকে তার অফিসে ডেকে নিয়ে ক্যান্টিনে ফেলে কী বকাটাই না বকলে, নিতান্তই খুব বড়সড়ো হয়ে গেছি নয়তো ধরে হয়তো দুটো চড়ই দিয়ে বসত।

বলল, ফের যদি তুই ঐ মেয়েটার দিকে তাকাবি আমি তোকে খুন করে ফেলব। আসলে ভাই চাইছে না যে, তার ভাই বিয়ে করে তার ঘাড়ে বোঝা হোক।

—আ-হা-হা আমি যেন তার ঘাড়ে বোঝা হতে যাচ্ছি।

—তবে? তোমাকে বিয়ে করে আমি রাখব কোথায়?

—কেন, যদ্দিন না তোমার চাকরি হয় আমি বাবার কাছে থাকব।

—আমি তোমাকে ছেড়ে থাকব কী করে?

—থাক আর ঢং করতে হবে না, এখন আছ কী করে?

লায়লা হাসল। এতক্ষণে নীড় প্রত্যাশী বিহঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখে। লায়লাকে প্রসন্ন করতে পেরেছে ভেবে খালেদ আশ্বস্ত হলো। বলল—

—কী করে যে আছি স্রষ্টাই জানেন।

—স্রষ্টা কী জানেন জানি না, কিন্তু আমি জানি তুমি কী মতলবে আছ?

লায়লা হাসছে কিন্তু ওর চোখ স্থির গম্ভীর।

—কী জানো তুমি? আবার লায়লার কী হলো চিন্তা করতে করতে জিজ্ঞেস করল খালেদ।

—তুমি আমার কাছ থেকে আরও দূরে পালানোর মতলবে আছ। প্রায় শত্রুর মতো কঠিন গলায় উচ্চারণ করল লায়লা। ওর মুখ থেকে সন্ধ্যাবেলার আলোর মতো হাসিটুকু মুছে গেছে তখন।

খালেদ শিউরে উঠল। এক মুহূর্ত আগে ওই মুখ দেখেই না আশ্বস্ত হয়েছিল খালেদ। মেয়েদের মন বোঝা কার সাধ্য। খালেদ বিপন্ন বোধ করল। তবুও অনেক কষ্টে চোখে তির্যক হাসির কুঞ্চন টেনে বলল— ধ্যাৎ, আমি বলে মরছি— চাকরির জন্য কপাল খুঁড়ে, তবে এবার হয়তো কপাল খুলবে, আশ্বাস পেয়েছি তোমার হয়ে শিগগিরই হয়তো একটা চাকরি পেয়ে

যাব। কিন্তু আমার যে আর তর সইছে না। হঠাৎ খালেদের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে উঠল লায়লা।

মুখ যখন সে নামাল, খালেদ দেখল মুখ তার পুব আকাশের মতো রাঙা। সেই রাঙা মুখে লায়লা গ্রীবার একটা বঙ্কিম ভঙ্গি করে বলল— যাই স্কুলের সময় হয়ে গেছে। বলে চোখের তীক্ষ্ণ কোণে হেসে চলে গেল লায়লা। চোখের সেই হাসিটাও পুব আকাশের অন্ধকার শিকারির বর্শার ফলার মতোই তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ হাসির বর্শা ফলকের আঘাতে সে যেন খালেদকে বিদ্ধ করে রেখে গেল। চোখের হাসিতে বিদ্ধ মুখের রঙে অভিভূত খালেদ অস্থির হয়ে উঠল। আবার পালাতে হবে। পালানোর একটা সুযোগ মাসখানেকের মধ্যে জুটে গেল খালেদের।

খালেদের মেজোবোনের স্বামী খাদ্য বিভাগের ইন্সপেক্টর। ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে তিন বছর পরে আবার ফিরে আসছে। তার বদলে যে যাবে তার ফ্ল্যাটটায় এসে উঠবে মেজো বোনরা খালেদকে সে চিঠি লিখেছে— ফ্ল্যাটটা গিয়ে দখল করে রাখতে।

খালেদ খুশির আনন্দে এমন বেসামাল হয়ে গেল যে, খবরটা যে ভগ্নীর কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে সেই জরুরি কর্তব্যটাও সে ভুলে গেল। সে ভুলের শাস্তি তারপর দিনই গোখরোর মতো ফণা তুলে এসে হাজির হলো।

উঃ লায়লার সে কী চেহারা! ওর চোখ, মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হলো ওর হাতের কাছে তলোয়ার পেলে খালেদকে এখনই কেটে ফেলতে পারে। কিংবা ও এখন ঝাঁপিয়ে পড়ে খালেদকে কামড়ে দেবে। মুখ দিয়ে তার খই ফুটছে তপ্ত বালি ছিটকে ছিটকে চারধারে গায়ে এসে পড়ছে।

—পাজি বদমাশ অসচ্চরিত্র— লম্পট লায়লার মুখে বলতে কিছু আটকাচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে ঘৃতাহুতিতে ক্ষিপ্ত অগ্নিশিখার মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে লায়লা, আহত মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর গোখরোর মতো ফুঁসছে, বিষ ওগরাচ্ছে— পালাচ্ছে, একটা মেয়েকে দিনের পর দিন ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখন সরে পড়ছে।

দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, পাড়ার ছেলেদের ডাকছি বলছি সব, এমন ঠ্যাঙানি দেবে যে পালানো বেরোবে। এক ফোঁটা পানির জন্য মানুষ মরুভূমিতে কেমন করে মরে— খালেদ এখন তা মনে মনে অনুভব করছিল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে, শুকনো বুক খাঁখাঁ করছে এমন করে যদি আর কয়েক মুহূর্ত কাটে খালেদ মরে যাবে। সরে যাওয়াই ভালো, খালেদ ভাবে। খালেদ বাঁচে তাহলে। তবু প্রাণপণে হাসতে চেষ্টা করল খালেদ, শেষে হাসতে পারল (ফাঁসির আসামি যদি হাসতে পারে) বলল—

আশ্চর্য, তুমি আমাকে এমন ভালো বেসেছ যে একটুখানি চোখের আড়াল পর্যন্ত সহ্য হচ্ছে না। এমন হলে আমি চাকরি-বাকরি পাব কী করে, তুমি কি চিরকাল বেকার করে রাখতে চাও নাকি?

—থাক থাক আর মুখের মধু দিয়ে চিড়ে ভেজাতে হবে না। লায়লা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেলল। সাত সকালে খালেদের ঘরে কী হচ্ছে বোন, দুলাভাই উৎকীর্ণ হয়ে শুনছিল, এইবার কান্না আরম্ভ হলে তারা এসে একে একে ঘরে ঢুকল।

—কী হয়েছে রে লায়লা?

বোন এসে তাকে বুকে টেনে নিল। বল, আমাকে খুলে বল। খালেদ যদি কোনো অন্যায় করে থাকে আমি এক্ষুনি তার ব্যবস্থা করব। বোনের স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে লায়লার কান্না আরও বেড়ে গেল। সে বোনের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে আরও উদ্দাম হয়ে ফোঁপাতে লাগল। সেই ফাঁকে খালেদ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সেই যে এলো আর যায়নি। বোনকে জানিয়ে দিয়েছে।— না আমি বিয়ে করব না। বিয়ে করতে আমার বড় ভয়। মনে হয়, পক্ষী জীবন শেষ হয়ে যাবে আমার। যেকোনো গাছের ডালে বসে নিভৃতে কূজন থেমে যাবে, মুক্ত ডানায় ভর করে নিঃসীম আকাশে উধাও হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে না আর। না। বরং অসচ্চরিত্র পাজি, বদমাশ বলুক, লম্পট বলুক, আমি লম্পট হব। তবু নয়। আমি কিছুতেই স্বামী হতে পারব না।

মেয়েদের ভোগ করা যায় কিন্তু বহন করা যায় না। বলেছিল সে তার ভগ্নীপতিকে।

লায়লা যদি সব বলতে পারে, খালেদ আচরণ দিয়ে তার প্রকৃতি বিচার করতে চায়, খালেদই বা নিজের সম্পর্কে আপন বিশ্বাস ব্যক্ত করে তার প্রতিবাদ করবে না কেন?

নতুন বাসা। কিছুই গোছগাছ হয়নি এখনও। সব যত্রতত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। কোথায় ছুরি, কাঁচি, ব্লেড আর কোথায় হাতদা, বঁটিদা হাত বাড়ালেই যে একটা পাওয়া যাবে এমন কোনো ভরসা নেই, অথচ এই শনের দড়িটাকে চার টুকরো করতে হবে। মশারি খাটাবে খালেদ। দাঁত দিয়ে কাটার চেষ্টা করেছিল, ব্যর্থ হয়েছে। দড়িটা হাতে নিয়ে কী করবে এখন ভাবছিল, মনে পড়ল মানিব্যাগের ছোট পকেটে ব্লেড থাকতে পারে। রাখে সে কখনো কখনো। সেই ব্লেড খুঁজতে— মানিব্যাগের পকেট থেকে বেরিয়ে এলো এক টুকরো কাগজ, একটা ঠিকানা। খালেদ ঠিকানাটা হাতে করে স্তব্ধ হয়ে রইল। বিষণ্ন হয়ে গেল তার মন। মনের ভেতরে ছি ছি করতে লাগল সে। এ কী করে সম্ভব হলো ভাবল খালেদ। কেমন করে সে ভুলে গেল নাড়ুর কথা! তিন তিনটা মাসের মধ্যে একদিনও নাড়ুর কথা মনে পড়ল না? অথচ কত কাল পরে সেদিন দেখা হয়েছিল। কত কাল? বুঝি বছর নয়-দশ কিংবা বুঝি তারও বেশি।

বুঝি নিয়তিরই নির্দেশ ছিল দেখা হবে। আমরা যথার্থ যোগাযোগটা জানি না বলে বলি অ্যাকসিডেন্ট। অবশ্যম্ভাবীকে আকস্মিক বলাটা আমাদের স্বভাব, নাকি অজ্ঞতা। আমরা যে সব জানিনে এটাই তার প্রমাণ। এই পৃথিবীটা খুব ছোট অথবা পৃথিবীটা গোল বলে কেউ হারিয়ে যায় সূর্য প্রদক্ষিণের পথে একদিন না একদিন দেখা হয়ে যায়। অবশ্যই দেখা হবে।

একদা খালেদ নাড়ুর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র ভাবেনি। এখন ভাবছে। ঠিকানাটা হাতে করে তাত্ত্বিক হয়ে উঠছে খালেদ।

কারণ সেদিন চিঠিটা খালেদের পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়েই লেখার কথা ছিল। ভাই বলল, তোর মেজো দুলাভাই তো চট্টগ্রাম বদলি হয়ে গেল রিতিমতো বড়বাবু হয়ে। এবার একটা চিঠি লিখে দে ওকে। ঢাকাতে কিছু হলো না। দেখ এবার যদি চট্টগ্রামে হয়। করে দিতে পারে। কে জানে, হয়তো ওর অফিসেই তোর একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।